আশাপূর্ণা দেবী

জন্ম ৮ই জানুয়ারি ১৯০৯ । মৃত্যু ১৩ই জুলাই ১৯৯৫

বাঙ্গালী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী নিঃসন্দেহে প্রথম সারির অধিকারী। প্রায় কিশোর বয়স থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ জীবন ভরে তিনি অবিরাম লিখে গেছেন। সেই সব গল্প উপন্যাস পাঠকহলে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। তাদের নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমা থিয়েটার ও টেলিভিশন সিরিয়াল; এখনও হয়ে চলেছে। লেখাগুলি যে শুধু জনপ্রিয় বলেই স্মরনীয় তা নয়; এদের গুণমানও উঁচুদরের। অন্তঃপুরের অন্তরালে বাস করেও বিদগ্ধ মহলের স্বীকৃতি তিনি আদায় করে নিয়েছিলেন। তাঁর পাওয়া অসংখ্য সাহিত্যপুরস্কার এরই প্রমাণ দেয়। নানা ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে এবং তার প্রভাব যে দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছেছিল তার প্রমাণ পাই বিদেশিনী বঙ্গতনয়া ঝুম্পা লহিড়ির কথায়। ঝুম্পা বলেছিলেন তাঁর সাহিত্যসাধনার অনুপ্রেরণা অনেকটাই এসেছিল আশাপূর্ণা দেবীর বই পড়ে।

এইরকম একজন লেখককে নিয়ে যতখানি চর্চা হওয়ার কথা তা কিন্তু হয় নি। সম্প্রতি তাঁর শতবর্ষ পার হল। সে উপলক্ষ্যেও মিত্র ও ঘোষ একটি শতবার্ষিক সংকলন প্রকাশ করেছে। দু তিনটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে সামান্য দু চারটি লেখা আছে। ব্যাস শুধু এইটুকু। লেখকেপাঠকে যাঁরা অনুঘটকের কাজ করেন বাংলা ভাষায় সেই সব গুনীর সংখ্যা তো কম নয়! আশাপূর্ণা সম্বন্ধে কেন তাঁরা উদাসীন? আলোচনার মধ্যে এর উত্তর আমরা ক্রমে ক্রমে পাব। আপাতত: আশা যাক তাঁর জীবনকাহিনীতে।

উন্মেষকাল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি উত্তর কলকাতার একটি বনেদি পরিবারে আশাপূর্ণার জন্ম হয়। বাবা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন বিখ্যাত ল্যাজারাস এণ্ড কোং এর ডিজাইনার। তদুপরি তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী। ভারতবর্ষ, মানসী, মর্মবানী প্রভৃতি মাসিকপত্রে তাঁর আঁকা ছবি ছাপা হত। বাড়িতে ছিল আলমারি ভর্তি বই। ছেলেদের জন্য ছিল স্কুল ও গৃহশিক্ষক। আশাপূর্ণার মা গল্পের বই পড়তে ভালোবাসতেন বলে তাঁর জন্য লাইব্রেরি থেকে বই আনানোর বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এইরকম একটি পরিবারেও মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। কারণস্বরূপ বলা হয়েছে তাঁদের ঠাকুমা নাকি মেয়েদের লেখাপড়া শেখার বিরোধী ছিলেন। তিনি নাকি মনে করতেন স্কুলে গেলে মেয়েরা 'ফেশানি' এবং 'বাচাল' হবে। এটা যে একেবারেই বাজে অজুহাত তাতে সন্দেহ নেই। সেকালের পুরুষশাসিত সমাজে বাড়ির কর্তারা যা চাইতেন সেটাই হোত। আসলে আশাপূর্ণার বাবাই চান নি তাঁর মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক।

কেন চাননি, এ প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে সেকালের ভ্রান্ত সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে। আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে মেয়েদের শিক্ষা চাকরি ও সম্পত্তির অধিকার যখন আইন ও সমাজ সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেয়েদের কাজ করতে দেখা যাচ্ছে, তখন সেকালের মেয়েদের এই অসহায় অবস্থা আমরা সঠিক ধারনা করতে পারব না। এক শতাব্দী আগেও আমাদের দেশে ছেলেদের ও মেয়েদের বিচার হত আলাদা আলাদা মানদণ্ডে। শিক্ষিত পুরুষ ছিল পরিবারের গৌরব। আর মেয়েটি লেখাপড়া শিখলে সে হয়ে যেত পরিবারের লজ্জা। ব্রাহ্মসমাজে বা বিশেষ বিশেষ উদারমনা পরিবারে এমনটা হত না বটে, তবে সাধারণ বাঙ্গালি পরিবারগুলিতে এমনটাই হত। স্ত্রীলোকের কাছে চাওয়া হত শুধু প্রশ্নহীন আনুগত্য। যতই সে অবরোধের মধ্যে বন্ধ থাকবে ততই তার সম্মান এই ভ্রান্ত ধারনা তাদের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। নইলে ''পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই/ তবে মেয়ের গুন গাই'' এর

সৃষ্টিসন্ধান

মত অশ্লীল প্রবাদের উৎপত্তি হত না। আশাপূর্ণার জন্ম হয়েছিল এই পরিস্থিতির মধ্যে।

কিন্তু পরিস্থিতিকে ছাপিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল তাঁর নিজের মধ্যেই। যে প্রণালীতে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন তা গল্পের মত চমকপ্রদ। বাড়িতে ছেলেদের জন্য গৃহশিক্ষক আসতেন। আর সেই সময় তাদের পিছনে বসে শিশু আশাপূর্ণা সব কিছু শুনতেন। তারপর অভ্যাস করতেন গোপনে। এই প্রণালীতে অল্পদিনেই তাঁর অক্ষরপরিচয় হয়ে গেল এবং যে কোনো বাংলা বই পড়বার ক্ষমতা জন্মাল অত্যন্ত অল্প বয়সেই। ব্যাস্, তারপর আর তাঁর কোনও কষ্ট রইল না। বাড়িতে অনেক রকম বই ছিল। পত্র পত্রিকাও আসত, আর পড়বার বিষয়ে তাঁর মায়ের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। আশাপূর্ণা প্রবল উৎসাহে, কিছুমাত্র বাছবিচার না করে হাতের কাছে যা পেতেন তাই পড়তে লাগলেন। তা সে মলাটছেঁড়া হেমচন্দ্র রচনাবলীই হোক, অজ্ঞাত লেখকের বিজয়বসন্তই হোক, বাঁধানো মানসী, মর্মমানী, প্রবাসীই হোক, বা রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরানির হাট, নৌকাডুবি, কথা ও কাহিনী যাই হোক। কৌতুক বোধ হয় যখন শুনি যমুনায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনও তিনি পড়তেন। যমুনা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শেষকালে গল্পটির কি হল তা আর তাঁর তখন জানা হয় নি। এইভাবে ছাপার অক্ষরে যা কিছু থাকত, মার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত পড়তে পড়তে তাঁর অপরিণত চেতনার পরিণতি ঘটতে লাগল। বাইরের জগতটা কি দিয়ে তৈরি, কেমনভাবে সেখানকার কাজকর্ম চলে, সংসারের সব কিছুই তাঁদের অন্তঃপুরের নিয়মে চলে না এইসব বুঝতে বুঝতে তাঁর একটা নিজস্ব বিচারবুদ্ধি তৈরি হতে থাকল। মানুষের জীবন তো এক ধারাবাহিক উন্মোচনের ইতিহাস, এবং সেই উন্মোচন কার কোন পথে হবে তা তো ঠিক হয়ে যায় তার শৈশবেই। আশাপূর্ণার বিধিলিপি এই ছিল যে তিনি হবেন মুক্তিকামী ও প্রশ্নাকুল। এই চারিপাশে যা কিছু ঘটে চলেছে, বিশেষতঃ মেয়েদের জীবন নিয়ে, সে বিষয়ে তাঁর প্রশ্নাবলী ছিল অনন্ত। — ''যে প্রশ্নগুলি আবাল্য আমায় বিক্ষত করেছে সেগুলিকে প্রকাশ করবার, সে প্রশ্ন অন্যের মনের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য ভিতরে তাগিদ অনুভব করেছিলাম। সে প্রশ্নের চেহারা অনেকটা এই : মানুষের গড়া সমাজে মানুষের এত দুর্গতি কেন? কেন এত অসাম্য? 'এই পৃথিবী আমারই জন্য' ক্ষমতাবানদের এমন নির্লজ্জ চিন্তা কেন? তুচ্ছের জন্য মানুষ নিজেকে বিকোয় কেন? মেয়েদের সব কিছুতেই এমন অধিকারহীনতা কেন? তাদের ওপর অন্যায় শাসনের জাঁতা চাপানো কেন? তার জীবন অবরোধের মধ্যে কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।...মেয়েদের কথাই বেশি করে ভেবেছি। এই সব প্রশ্ন চিরকাল আমায় যন্ত্রণা দিয়েছে। আর এই 'কেন' র উত্তর খুঁজে বার করবার জন্য অস্থির করেছে। ভাবতে বসেছি এই অদ্ভুত ব্যবস্থায় কে বেশি বঞ্চিত? কে বেশি বেচারি? শাসিতরা, না শাসকরা?''

(খেলা থেকে লেখা ঃ আশাপূর্ণা দেবী: দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮২)

এইভাবে নিতান্ত বাল্যকাল থেকে আশাপূর্ণা দেবী সাহিত্যের মাধ্যমে পাওয়া তাঁর আদর্শজগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের তুলনা করতেন, এবং নবলব্ধ উচ্চতর মূল্যবোধের দ্বারা বাস্তব জগতের বিচার করতেন, তার মনের মধ্যে ক্রমে তৈরি হয়ে উঠতে লাগল একটি ভাবমণ্ডল, এবং সেই ভাবসমূহ খুঁজতে লাগল নির্গমনের পথ। মাত্র তেরো বছর বয়সে আশাপূর্ণা ডাকযোগে শিশুসাথী পত্রিকার দপ্তরে একটি কবিতা পাঠালেন। কবিতা ছাপা হবে কিনা এ নিয়ে তাঁর মনে অনেক সন্দেহ ছিল। কিন্তু অচিরে সে সন্দেহ ঘুচিয়ে সম্পাদকের জবাবি চিঠি এল। তাতে আছে সপ্রশংস অনুমোদন এবং আরও রচনার অনুরোধ, শুধু কবিতা নয়, গল্পও। এই উৎসাহস্পর্শে বালিকা লেখিকার কলমের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি শিশুসাথীতে এবং শিশুসাথীর পরিচয়ে সেকালের অন্যান্য ছোটদের পত্রিকায় অনর্গল গল্প কবিতা লিখতে লাগলেন। এমন একবারও হয় নি যে কোনো রচনা ফেরৎ এসেছে। বরং আরও লেখার তাগিদ এসেছে সব জায়গা থেকে। পরবর্তীকালে সেইসব সম্পাদকদের উদ্দেশে আশাপূর্ণা অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বলেছেন

সৃষ্টিসন্ধান

ঐ সব অনুরোধপত্রই তাঁকে লেখিকা করে তুলেছিলেন। তাঁর লেখকজীবনে এঁদের দান অবিস্মরণীয়।

বিকাশপর্ব।।

অবশ্য সেই ১৩২৯ থেকে ১৩৮৩ (ই ১৯২২ - ১৯৩৬) পর্যন্ত সুদীর্ঘ চোদ্দবছর আশাপূর্ণা সসঙ্কোচে শুথু শিশুসাহিত্যের লেখিকা হয়েই থেকে গিয়েছেন। তাঁর ভাষায় ''প্রেম, ভালোবাসা, প্রণয় প্রণয়ভঙ্গ, বিরহমিলন এদের গায়ে কলমের খোঁচা দিতে যাই নি। শিশু সাহিত্য নিয়েই একেছি।'' কেন থেকেছেন? উত্তরটা কঠিন কিছু নয়। তখন তাঁর অল্প বয়স। সংসারে নিজের অবস্থানটা তখনও খুব পাকাপোক্ত নয়। কার মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে এরকম ভয় তাঁর নিশ্চয়ই হয়েছিল। আশাপূর্ণা নিজে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। কেবল জানিয়েছেন ঐ 'কালপর্বে অন্যতর যে সব ভাবনা তাঁর মনে উঠত সেগুলি তিনি চুপি চুপি কবিতার খাতায় লিখে রাখতেন। সম্পাদকদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করতেন না।

ইতিমধ্যে ১৩৩১ (১৯২৪) সালে পনেরো বছর বয়সে কৃষ্ণনগরের এক একান্নবর্তী পরিবারে আশাপূর্ণার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্বামী যে তাঁর পায়ে বেড়ি পরিয়ে অসূর্যম্পশ্য করে রেখে দেন নি আশাপূর্ণার পরিণত বয়সের দীর্ঘ সাহিত্যসাধনা তারই প্রমাণ। কিন্তু সেদিন পঞ্চদশী পত্নীর জন্য কিশোর স্বামীর কিছু করনীয় ছিল না। আর আশাপূর্ণার ভাষায় ''মেয়েদের পক্ষে শ্বশুরবাড়ি জায়গাটা তো আর কুসুমকোমল নয়। তা ছাড়া সে তো আবার পিতৃগৃহের পর্দার থেকেও অনেক ঘোরালো। স্রেফ লৌহ যবনিকার অন্তরালে।'' ফলে সাময়িকভাবে তাঁর সাহিত্যসাধনা স্থগিত রইল।

তাছাড়া আর একটা মস্ত বড় অসুবিধা হল তাঁর। মফঃস্বলের পতিগৃহে ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর একখানি মাত্র বই ছিল পঞ্জিকা। ফলে ক্ষুধিত আশাপূর্ণার অনেক দুপুরই কাটত সেই পঞ্জিকার রাশিফল ও রাক্ষুসে মুলোর বিজ্ঞাপন পড়ে। ভাগ্যক্রমে এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ বৃহৎ পরিবারের একাংশ কলকাতায় চলে আসে। আশাপূর্ণা ছিলেন ঐ অংশের একজন। শহরের নতুন সংসারে তিনি কিছুটা মুক্তির স্বাদ পেলেন। তাঁর বইপত্র ও লেখালেখির জগৎ আবার একটু একটু করে ফিরে এল। ফিরে এল বটে, তবে লক্ষনীয় এই যে তাঁর সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি শুধু শিশুদের জন্যই লিখলেন। বড়দের জন্য লিখতে হলে অনেক স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে হোত। অনেক বৈপ্লবিক কথা বলতে হোত। তিনি কি কুণ্ঠিত হয়েছিলেন 'ঘরের বউ' হয়ে সে সব কথা বলতে? তাঁর গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে নারীজীবনের এই সব গোপন কথাগুলি সবই পরবর্তীকালে ব্যক্ত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে লেখিকা হিসাবে আশাপূর্ণা যথেষ্ট বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। বুদ্ধিমান প্রকাশকরা মনে করছিলেন এইরকম রচনাশক্তি নিয়ে ছোটদের জগতে আটকে থাকা স্রেফ প্রতিভার অপচয়। অনেক দিন ধরেই তাঁরা তাঁকে বড়দের জন্য লিখতে বলছিলেন। অবশেষে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি একটি ছোটোগল্প লিখলেন নাম পত্নী ও প্রেয়সী। তারপর আনন্দবাজারের রবিবারের পাতায়। তারপর অন্যান্য পত্র পত্রিকায়। আশাপূর্ণা প্রাপ্তবয়স্কদের লেখক হিসাবেও বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

কুণ্ঠা নিয়ে তিনি বড়দের জগতে পা রেখেছিলেন বটে, কিন্তু গল্পগুলি পড়বামাত্র আমরা বুঝতে পারি তাদের ভেতরে কোনও কুণ্ঠিত ভাব নেই। মেয়েদের চোখ দিয়ে দেখলে মেয়েদের জগৎটা কেমন ঠেকে তার বাস্তব চিত্র ইতিপূর্বে আমরা বিশেষ পাই নি। ক্ষীনস্বরে বিভিন্ন মহল থেকে সেই কথাটা মাঝে মাঝে শোনাও যেত। যে আশাপূর্ণাই আমাদের দেশের প্রথম মহিলা সাহিত্যিক, অথবা তিনিই প্রথমে মেয়েদের বিষয়ে লিখেছেন। তাঁর আগের যুগেও মেয়েরা লিখেছেন। আর বাংলা সাহিত্য তো চিরকালই নারীচরিত্রপ্রধান, নারীকে বিষয়বস্তু করায় তাঁর

সৃষ্টিসন্ধান

কোনোও নতুনত্ব ছিল না। কিভাবে তিনি মেয়েদের দেখলেন সেখানেই তাঁর নতুনত্ব।

মেয়েদের লেখালিখি।।

আমাদের দেশে মেয়েরা যখন প্রথম সাহিত্যজগতে এলেন তখন তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মিশ্র। রক্ষণশীল সমাজের কাছে শিক্ষিত মেয়েরা ছিল ব্রাত্য বা হাস্যাস্পদ। কিন্তু লেখাপড়া জানা যে উদার সমাজ যেখানেও মেয়েদের মস্তিষ্কচালনা নিয়ে প্রচুর সন্দেহ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাচীনা ও নবীনা যদিও রসরচনা তাহলেও কার্পেট বোনা, নভেল পড়া, পায়ের ওপর পা দিয়ে পটের বিবি হয়ে বসে থাকা নবীনাদের প্রতি তাঁর খোঁচাটা যেন তুলনায় একটু বেশিই। আর কমলাকান্তের সেই বিখ্যাত উক্তি ''স্ত্রীলোকের বিদ্যা নারিকেলের মালার ন্যায়, কখনও আধখানা বই পুরা দেখিলাম না' আজও বিদূষী রমনীদের গায়ে জ্বালা ধরাবার পক্ষে যথেষ্ট। তাও বঙ্কিমচন্দ্রের কাল ছিল পুরনো। তাঁর অনেক পরের লোক শরৎচন্দ্রও যে বেশি লেখাপড়া জানা মেয়েদের ওপর প্রসন্ন ছিলেন না তাঁর সারা রচনাবলীতেই তার প্রমাণ আছে। যাই হোক পত্রিকা সম্পাদকেরা কিন্তু নারীস্বাক্ষরিত রচনা খুব পছন্দ করতেন। তাঁরা ভাবতেন এর দ্বারা পাঠক আকৃষ্ট হবে। তাঁদের এই প্রশ্রয়ের সুযোগ নিয়ে অনেক নবীন লেখক মেয়েদের ছদ্মনামে নিজেদের লেখা পাঠাতেন এবং তা ছাপাও হত। এ সব ছলনার গল্প বাদ দিলেও সত্যি সত্যি যে সব মহিলারা লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতেন তাঁদের সম্বন্ধে সাহিত্যসমাজে একটা পিঠ চাপড়ানো ভাব থাকত। আহা, অবলা নারী, সাহস করে লিখছে যখন লিখুক, খানিকটা এইরকম মনোভাব নিয়ে তাঁরা সে সব রচনাকে দেখতেন। বৃহত্তর যে সব জিজ্ঞাসা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ব, দর্শন বিজ্ঞান সে সব নিয়ে চর্চা করবার অধিকার যেন পুরুষেরই একচেটিয়া এইরকম একটা সংস্কার তখন প্রচলিত ছিল। এতদূর বদ্ধমূল ছিল সেই সংস্কার যে অনেক পরে বানী রায় বা কবিতা সিংহেরা যেখন তাঁদের জোরালো বক্তব্যবাহী গল্প উপন্যাসগুলি লিখতে লাগলেন, এবং স্ত্রী পুরুষ যৌন সম্পর্ককে নতুনভাবে নারীর দিক দিয়ে বিশ্লেষনে নামলেন, তখন প্রথমে লোকের বিশ্বাসই হয় নি এগুলি কোনও মহিলার কলম থেকে বেরিয়েছে। যখন বিশ্বাস হল তখন লেখিকাদের প্রাপ্য হল বেহায়াপনার জন্য নিন্দাবাদ ও পরবর্তী স্তরে উপেক্ষা। আজ হাওয়া বদলেছে। আজ মহাশ্বেতা দেবীকে বা তিলোত্তমা, সঙ্গীতা মন্দাক্রান্তাদের কেউ পুরুষ বলে ভাববে না, বা পুরুষের চিন্তনীয় জগতে অধিকার প্রবেশ করেছেন এমনটাও মনে করবে না। কিন্তু সেদিন আবহাওয়া ছিল অন্যরকম।

অন্ত:পুরের কথা এবং মেয়েদের কথা লেখা ছাড়া সেদিন লেখিকাদের অবশ্য উপায়ও ছিল না কিছু। যে লোক কোনোদিন ঘরের বাইরে বেরোলো না, কোনো অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হল না, যৌবন আসবার আগেই যার বিয়ে হয়ে গেল, এবং পূর্ণযৌবনা হবার আগেই যে বহুসন্তানবতী ভারাক্রান্ত গৃহিনীর পদে অধিষ্ঠিত হল, তার অভিজ্ঞতা ও মনোযোগের জগৎটা ছোট হতে বাধ্য।

সাংসারিক অভিজ্ঞতায় অকালপক্ক হবার একটা জায়গা অবশ্য তাদের ছিল। সে হল সেকালের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারগুলির অন্দরমহল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তা ছিল পারাবতকাকলিসংকুল গৃহসৌধবৎ মুখরিত। 'সেখানকার ওপরলার আপাতশৃঙ্খলার তলায় তলায় স্বার্থবুদ্ধির যে কুটিল প্রবাহ বইত তার সঙ্গে মেয়েদের পরিচয় হয়ে যেত ভালো করে জ্ঞানচক্ষু ফোটবার আগেই। শরৎচন্দ্র ও অন্য কোনো কোনো লেখকের রচনায় আমরা সেকালের একান্নবর্তী পরিবারগুলির যে মধুর ছবি দেখি ও যে যশোগান শুনতে পাই তা অনেকখানি তাঁদের শৈশবের স্মৃতিকাতরতা দিয়ে আঁকা। বাস্তবটা অত মসৃন ছিল না। বাস্তবের কামড় ভোগ করতেন মেয়েরা, বিশেষ করে সেই সব মেয়েরা যাঁদের স্বামীদের উপার্জন বা দাপট কম হত তাঁরাই। সুখস্বাচ্ছন্দ্য খুব কম মেয়ের কপালেই জুটত। স্বাস্থ্যসচেতনতা ছিল না, চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল পিছিয়ে। তার

সৃষ্টিসন্ধান

উপর অশিক্ষা অবহেলা ও কুসংস্কারের ফলে আধিব্যাধি লেগেই থাকত। ফলে অকালবৈধব্য ও সন্তানশোকের মত মর্মান্তিক দুঃখ অনেক মেয়েকেই সইতে হত। এরই মধ্যে যারা কিছু লেখাপড়া জানত বা অন্যরকম জীবনের স্বপ্ন দেখত তাদের মুক্তির একটা জায়গা দিল বাংলা গল্পের বই। তাই বলে সাহিত্যের সম্পূর্ণ স্বাদগন্ধ যে তাদের আয়ত্তে ছিল তা তো নয়। সীমিত পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে সব রকম বই তারা আয়ত্ত করতে পারতেন না। তাছাড়া তাঁদের বইপত্রের জোগানদার ছিল বাড়ির কোনো সহৃদয় পুরুষ যে পাবলিক লাইব্রেরি থেকে তা এনে দেবে। এই ভাবে পরোক্ষ প্রণালীতে অন্যের অনুমোদনসাপেক্ষে কিছু বইপত্র সেকালের সাধারণ মেয়েরা পড়তে পেতেন। এদিকে বিংশ শতাব্দীর সেই প্রথম পাদে, নব নব পরীক্ষানিরীক্ষা পৃথিবীর সাহিত্যমানচিত্রে একটা ওলটপালট চলছে; তার বিষয় ও প্রকরণ বদলে যাচ্ছে অতি দ্রুত। আশাপূর্ণার সঙ্গে একই বছরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে বুদ্ধদেব বসু, তিনি তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই সেই পরিবর্তমান বিশ্বসাহিত্যের খোঁজ রাখছেন এবং নিজেকে প্রস্তুত করছেন ভবিষ্যৎ সাহিত্যকর্মের জন্য; তখন আশাপূর্ণার মতো মেয়েদের জগৎটা কয়েক প্রজন্ম পিছিয়ে রয়েছে। উর্ধ আকাশে তাঁরা মাথা তুলবেন কী করে? ভাবতে অবাক লাগে যে আশাপূর্ণার অব্যবহিত আগের পর্বে যাঁরা ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখিকা, তারা প্রায় সকলেই বালবিধবা, অনেকেই নিঃসন্তান। যেন বিদ্যাচর্চা তাঁদের নিঃস্ব জীবনের সান্ত্বনা মাত্র, স্বাভাবিক অধিকার নয়। অনুরূপা, নিরুপমা জ্যোতির্ময়ী, প্রসন্নমরী, প্রিয়ংবদা দেবীরা সাহিত্যে হাত দিয়েছেন সংসারজীবন শেষ হবার পর। ব্রত, নিয়ম, উপবাস, সংযমে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বাস্তব জীবন থেকে তাঁরা মুক্তি খুঁজতেন আদর্শের ধ্যানে। 'দিদি' 'মন্ত্রশক্তি' 'পোষ্যপুত্র' 'মা' প্রভৃতি সেকালের প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলি এরই দৃষ্টান্তস্থল। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষনশক্তির জোরে লেখিকারা উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র ও প্রতিবেশ রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাস্তাবুদ্ধির প্রমাণ রাখতেন। কিন্তু উপন্যাসগুলির মৌল বক্তব্যে ও প্রধান চরিত্রগুলির চিত্রনে কাজ করত তাঁদের অন্যতর সংস্কার। বিশেষ করে নায়িকাদেরই তাঁরা রক্তমাংসের মানুষ না করে মহীয়সী দেবী বানাতেন। সেই সব আদর্শায়িত নায়িকাদের জীবন যেন পারথেই উৎসর্গীকৃত। যেন তাদের নিজেদের কোনও চাহিদা নেই। বিশেষ করে মানবমনের একটি স্বাভাবিক ধর্ম তাদের যৌনকামনার দিকটি কখনো উচ্চারিত হয় নি। নারীরা সেখানে সর্বদাই প্যাসিভ, তারা শুধু পুরুষের ডাকে সাড়া দেবে বা দেবে না। পঙ্কিল সংসারের বাইরে এক মহিমময় উচ্চতায় তাদের অবস্থান। এদিকে উনবিংশ বিংশ সন্ধিক্ষনে আমাদের দেশের গড়পড়তা পুরুষ লেখকদের মধ্যেও নারীকে দেবী বানাবার একটা প্রবণতা এসেছিল। নীরদ, সি। চৌদুরি তাঁর 'বাঙ্গালী জীবনে রমণী' নামক গ্রন্থে তার সামাজিক ও নান্দনিক কারনগুলি সবিস্তার ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে সে সব নিয়ে আলোচনা অবান্তর হবে। সংক্ষেপে এ কথা বলা যায় যে সমাজের ও বক্তিস্বভাবের কোনো কোনো অবস্থায় পুরুষ নারীকে আদর্শায়িত করে দেখে এটা মনস্তাত্বিক সত্য। গ্রীক পুরাণের গ্যালেশিয়া, দান্তের বিয়াত্রিচে, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরী তার তূরীয় রূপ। আর রবীন্দ্রনাথের আনন্দময়ী (গোরা), শরৎচন্দ্রের অন্নদাদিদি, কমললতা (শ্রীকান্ত ১ ও ৪)। তারাশঙ্করের জ্যোতির্ময়ী (ধাত্রীদেবতা), প্রবোধ সান্যালের ভাস্বতী (বনহংসী) তার লৌকিক রূপ। মনস্তত্বের থিয়োরি অনুসারে নারীর রচনাতেও সেইরকম কোনো আদর্শ কল্পপুরুষ নির্মান হওয়ার কথা। যদিও এখনও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে তা হয় নি। বিশ্বসাহিত্যেও কোনো নারী তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে আর একটা ডিভাইন কমেডি লিখেছেন এমন জানা যায় না। যাই হোক বাংলা সাহিত্যের একটা অংশে আশাপূর্ণার আগমনকালে স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রচিত্রণে ভারসাম্য থাকছিল না। উভয়পক্ষই প্রাণপনে নারীর মহিমাগান করছিলেন।

আশাপূর্ণার পৃথিবী।

আশাপূর্ণার কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি তাঁর সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়েও নারীসম্পর্কিত এই

সৃষ্টিসন্ধান

'মিথ' ভাঙলেন। ছোটগল্প থেকেই এ কাজ সুরু হল। ১৯৩৬ সালে প্রথম ছোটগল্পটি লেখার আট বছর পরে আশাপূর্ণা তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন ১৯৪৪ সালে। তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। কেন এতকাল উপন্যাস লেখেন নি? তাঁর কি মনে হয়েছিল তাঁর সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় জীবনের ছোট ছোট তরঙ্গভঙ্গগুলিই ভালো দেখানো যায়? অথবা তিনি আরও পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন? সম্ভবত: দুটোই। তবে ছোটগল্পেও তিনি কম প্রখর নন।— ''আমার লেখার উপজীব্য কেবলমাত্র মানুষ। প্রকৃতিপ্রেমিক লেখকের বর্নাঢ্য রচনা আমায় আকৃষ্ট করে। আনন্দ আর বিস্ময়ের স্বাদ এনে দেয়। কিন্তু ও আমার সাধ্যের বাইরে। সাধ্যের মধ্যে শুধু মানুষ। মধ্যবিত্ত ঘরোয়া মানুষ, যে আমার একান্ত চেনা জানা। আমি আমার জানা জগতের বাইরে কখনো হাত বাড়াতে যাই না।

কিন্তু যাদের চিনি জানি বলে মনে করা যায়, তারা কি সত্যিই চেনা? বিচিত্র চরিত্র এই মানুষের জগতটাকে কে কবে চিনেছে? সে নিজেই জানেনা সে কি জন্যে কি করে বসে। ...দেখতে দেখতে কোথায় যেন একটা জানলা খুলে যায়। অনুভবে আসে মানুষের যতটুকু দেখি সেইটুকুই সব নয়। মনে হতে থাকে সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে যে সম্পর্কের বন্ধন তার অনেকটাই অভ্যাসের অনুশাসন মাত্র। একসময়ে যা জীবনের বনেদ বলে মনে হয় সে হয়তো মুহূর্তেই শূন্যের অঙ্কে পরিণত হযে যেতে পারে। তাও মানুষ অভ্যাসের সংস্কারটাকেই আঁকড়ে বসে থাকে'', (দেশ: সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২)

আশাপূর্ণার গল্পের সংখ্যা সহস্রাধিক। তার থেকে চোখ বুজে তিন চারটি তুলে নেওয়া যাক। এগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ বা বাছাই গল্প নয়। তা হলেও এর থেকে আভাস পাওয়া যাবে তিনি তাঁর চেনা জগতটাকে কী চোখে দেখতেন।

মানুষে মানুষে পারিবারিক সম্পর্কটা স্বত:সিদ্ধ কিছু নয়। তাকেও যত্ন করে লালন ও রক্ষা করতে হয়। না হলে শুধুমাত্র একঘেয়েমি থেকে কিভাবে জীবনের সব রস শুকিয়ে যায় সে বিষয়ে গল্প হল 'দুপুর রোদে'। ভলোবেসে বিয়ে করে সংসার পেতেছিল প্রবোধ দা। সেদিনের কর্মকাণ্ডে সাক্ষী ও সহায়ক ছিল তার সদ্য কিশোর মামাতো ভাই সোমেন। সে ঘটনার একযুগ পরে সোমেন প্রবাস থেকে কলকাতায় আসছে। পূর্ব সম্পর্ক স্মরণ করে হাওড়ায় নেমে বাড়ি যাবার আগে প্রথমেই সে গেল প্রবোধদার অফিসে। গিয়ে শুনল সে দিনকয়েক ছুটি নিয়ে এখন বাড়িতে আছে। বাড়িতে এসে শুনল প্রবোধ অফিসে গেছে। প্রবোধ নাকি ছুটি নেবার ছেলেই নয়। তার বউয়ের মুখে এখন স্বামী সম্পর্কে অনন্ত অভিযোগ। সেদিনের সেই মিষ্টভাষী প্রাণবন্ত তরুণীটি আজ উগ্রমেজাজের এক কুটিল রমনী। নিজের অথর্ব শাশুড়িকে সে পারলেই উত্যক্ত ও অপদস্থ করে। শাশুড়িও বৌকে সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখে এবং গালিগালাজে কিছুমাত্র কার্পণ্য করে না।

ছেলেমেয়েগুলিকে সাক্ষী রেখেই তাদের পারস্পরিক চাপান উতোর চলে। সোমেন সে বাড়ি থেকে চলে এসে অন্যত্র যেতে যেতে এক পার্কের বেঞ্চিতে শয়ান প্রবোধদাকে দৈবাৎ আবিষ্কার করে ফেলে। হ্যাঁ, অফিস থেকে সে ছুটি নিয়েছে ঠিকই। দুদিন বিশ্রাম করবে বলে নিয়েছে। বাড়িতে এসব জানে না। সেখান থেকে যথাসময়ে বেরিয়ে আসে ও ফিরে যায়। অবাক সোমেন এরকম ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে ''ছুটির কথা কি বলতে আছে বাড়িতে? রাজ্যের কাজ তুলে রেখে দেয় ঐ একটি দিনের জন্য ...ছুটি পেয়েছ, এ মেয়ের পাওর খোঁজো, ও মেয়ের তত্ব পাঠাও, বুড়ো শ্বশুরের খবর আনো, রুগনো শালিকে দেখে এসো, কত বায়নাক্কা। তা ছাড়া সেলাই কল ভেঙে আছে। পায়খানার ট্যাঙ্কে জল নেই, রান্নাঘরের ছাদ ফুটো, কাপড়ের অভাবে লজ্জা বাঁচছেনা, ঝি পালিয়েছে, ধোপা আসছে না, তেল নেই, বলে কিনা কিসের কাজ!'' লেখিকা মন্তব্য করেছেন ''যাহারা প্রতিনিয়ত নিজেকে বঞ্চনা করিয়া চলে, তাহারা বঞ্চিত জীবনের সমস্ত গ্লানির দায় পরস্পরের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হয়।''

সৃষ্টিসন্ধান

'পদ্মলতার স্বপ্ন' গল্পে নারী মনস্তত্ত্বের এক কুটিল ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করি। পদ্মলতার মা ছিল যদু লাহিড়ির বাড়ির রাঁধুনি । ভদ্রঘরের বউ, অবস্থাবিপাকে পড়ে দূর সম্পর্কের জ্ঞাতির ঘরে এইভাবে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু তাকে সে সম্মান কেউ দেয় নি। তার উঠতি বয়সের পরমাসুন্দরী মেয়ে পদ্মলতাকে রাধুনি বামনির মেয়ে বলে ঘরে বাইরে অনেক অপমান সইতে হয়েছে। লোকে তাকে পদ্মলতা বলেও ডাকতো না, ডাকতো পদি বলে। সান্যাল বাড়ির লোভনীয় ছেলে মুরারি তার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে চাইত। কিন্তু বিয়ের কথা ওঠার আগেই উপহাসের হাসি হেসে বলেছিল ''তোর কি ধারনা আমি তোকে বিয়ে করব? ওই আনন্দেই থাক। আমার মা তাহলে আর কুলো নিয়ে বরণ করতে আসবে না, আমাকে শুদ্ধু কুলোর বাতাস দিয়ে দূর করে দেবে।'' তারপর কপালক্রমে বা ঘটনাচক্রে সেই পদিরও বিয়ে হয়ে গেল দূর দেশের এক গরিব ছেলের সঙ্গে। পদির মাও মরে গিয়ে মুক্তি পেল। এ সব ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন পদ্মলতা এই গ্রামে বেড়াতে এলো, একাই। খুব সম্পন্ন ঘরে বিয়ে হয়ে যাওয়া আদরিনী গরবিনী মেয়েরা যেমন গরিব বাপের বাড়িতে এসে চারিদিকে দান ধ্যান করে, টাকা পয়সা ছড়িয়ে একটা সোরগোল তুলে দেয় সেভাবেই এলো পদ্মলতা। তার স্বামী নাকি এখন যুদ্ধের বাজারে কনট্রাকটারি করে প্রচুর পয়সা করেছে। একা একা আসছে বলে পদ্মলতার গায়ে তেমন গয়নাগাঁটি নেইবটে। তাই বলে তার চালচলন দেখে বোঝাই যায় তারা বিস্তর পয়সা করেছে। গ্রামের ঘরে ঘরে এখন পদ্মলতার নেমতন্ন হচ্ছে, সবাই তার রূপগুনের ভুয়সী প্রশংসা করছে, সবাই বলছে তারা তো গোড়া থেকেই জানতো পদ্মলতার মতো মেয়ে হয় না। এদিকে মুরারির অবস্থা গেছে বদলে। নিজে সে মানুষ হয় নি। তার ওপর বাপের মৃত্যুর পর দেনার দায়ে বাড়ি বাঁধা পড়েছে। রোগে, অচিকিৎসায় অভাবে প্রায় পঙ্গু হয়ে সে বাড়িতে বসে থাকে। হাস্যমুখী পদ্মলতা সেখানে গিয়েও হানা দেয়। জেনে নেয় কত টাকায় এ বাড়ি বাঁধা পড়েছে। তারপর আঁচলের গিঁট খুলে যেন অবহেলাভরে টাকা কটা ছুঁড়ে দেয় মুরারির দিকে। আগ্রহভরে কুড়িয়ে নেয় মুরারির বউ। পদ্মলতা বলে এই সামান্য কটা টাকার জন্য ভদ্রাসনটুকু যাবে?' সামান্য দুদিনের জন্য এসেছে পদ্মলতা। এইবার সে ফেরবার তোড়জোড় করে। আর ঠিক সেই সময়ে বাড়িতে বসে তার স্বামী পদ্মকেই চিঠি লিখছিল— ''পদ্ম, আমার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। পাটনায় যে চাকরিটার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম আর সেটা হইবার সম্ভাবনা নাই। সিকিউরিটি দিবার জন্য ভিটেমাটি জমিজমা যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া যে চার হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম সে টাকা খোয়া গিয়াছে। আমার বিশ্বাস এ জ্ঞাতি শত্রুর কাজ। কাহাকে কি বলিব, আমি আজ সর্বস্বান্ত। তুমি ঘরের লক্ষী ঘরে থাকিলে আমার এ দুর্দশা ঘটিত না। যাই হোক পত্রপাঠ চলিয়া আসার ব্যবস্থা কর।''

নারী মনস্তত্ত্বের এক বিকৃত রূপ আছে 'ছিন্নমস্তা' গল্পে। এ রকম নিষ্ঠুর গল্প বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই। গল্পটি এইরকম! বিধবা জায়াবতী বড় সাধ করে আদর করে একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী বউ ঘরে এনেছিলেন। বউ কিন্তু শুধু সুন্দরী নয়, চতুরও ছিল খুব। সংসারে আসার সঙ্গে সঙ্গে মা ও ছেলের সম্পর্ক ভাঙতে সচেষ্ট হল। নারীর সহজাত বুদ্ধিতে সে বুঝেছিল তার স্বামীর মতো দুর্বল ব্যক্তিত্বের পুরুষকে সে সহজেই তার যৌবনের যাদুমন্ত্রে বশ করে ফেলবে, আর পুরুষমানুষ একবার বশ হয়ে গেলে তারপর তাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে সংসারের আধিপত্য বিস্তার করতে তার কোনো অসুবিধা হবে না। এ কাজে সে অচিরে সফল হল। শিঘ্রই এমন দিন এল যখন দুজনেরই মৌখিক ভদ্রতার আবরণ খসে গেছে। এবং দুজনেই পাড়ার লোকের কাছে পরস্পরের নিন্দা করতে লজ্জা পাচ্ছে না। তবে এই খেলায় সর্বাংশে জিত ছিল বৌ প্রতিভারই। জয়াবতীর ভদ্রতার সংকোচ ছিল। বৌয়ের তা ছিল না। তাছাড়া রূপ যৌবন ও স্বামীগর্ব নিয়ে বিধাতা ছিল তার সহায়। তাই কারণে অকারণে উঠতে বসতে খাওয়া শোয়া চালচলন নিয়ে জয়াবতীকে সে সর্বদা অপমান করত। নিরুপায় জয়াবতীর কিছু করার ছিল না। নিরামিষাশী

সৃষ্টিসন্ধান

বালবিধবা, শাক ডাঁটা চচ্চড়িপ্রিয় জয়াবতীর, এই খাওয়ার খোঁটাটাই সবচেয়ে বেশী মর্মান্তিক লেগেছিল। প্রথম দিন চোখের জল তার বাঁধ মানে নি। এইরকম যখন অবস্থা তখন হঠাৎ যেন ভাগ্যের পরিহাসের মত এক অঘটন ঘটল। এক দুর্ঘটনায় ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল। বাড়ীতে নেমে এল শ্মশানের স্তব্ধতা। লোকে মনে করল জয়াবতী বুঝি আর শয্যা ছেড়ে উঠবে না। ক্রমে দিন কাটে। আস্তে আস্তে সবাই উঠে দাঁড়ায়। জীবনযাত্রা আবার শুরু হয়। ঝগড়াঝাঁটি আপাতত: কিছু নেই। শাশুড়ি বউ দুপুরবেলা একসঙ্গে খেতে বসে। জয়াবতী যত্ন করে বৌকে খাওয়ায়। তারপর শোনা যাক লেখিকার বর্ণনা।— ''চকচকে কালো পাথরের বড় থালায় পরিপাটি করিয়া সাদা ধবধবে আতপচালের অন্ন বাড়িয়া রাখিয়া জয়াবতী ডাকেন, বৌমা, অ বৌমা, নেমে এসো মা, দুটো মুখে দিয়ে যাও। কণ্ঠস্বরে মমতার মাত্রাটা বড় বেশি পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। আশেপাশে জ্ঞাতিদের বাড়ি হইতে শুনিতে পাওয়া যায়।''

জ্ঞাতি মহিলারা প্রত্যাশামতো এ বাড়িতে পৌঁছে যান, কারণ সদ্যবিধবার আহার দেখাতেও বেশ মজা আছে।

''ইঁহাদের মুখপানে চাহিয়া করুণ নালিশ জানান জয়াবতী– 'এস দেখো ভাই খাওয়ার দশা। তাই তো বলি বৌমাকে, মরবার তো পথ নেই মা, বেঁচে থাকতেই হবে চিরকাল, বিধবার পরমায়ু মার্কন্ডের পরমায়ু। না খেলে চলবে কেন? কচু ঘেঁচু, শাকপাতা খেতে হবে গুচ্ছির। যেমন কপাল।

সমস্বরে সায় দেয় সমাগতার দল।

আচ্ছা, জয়াবতীর কণ্ঠস্বরটাই শুধু কানে ঢোকে তাদের। দৃষ্টি পড়ে না মুখচ্ছবির পানে? কণ্ঠস্বরে মমতার যে প্রস্রবণ বয়, চোখের দৃষ্টিতে আছে কি তার স্নিগ্ধচ্ছায়া? আছে চোখের দৃষ্টিতে আর ঠোঁটের কোনে অতি সূক্ষ্ম রেখায় লুকানো বিষাক্ত হাসির আভাস?''

স্থূল কামনা শুধু পুরুষের নয়, নারীরও আছে। এতাবৎকাল অনুচ্চারিত এই সত্য কথাটিও আশাপূর্ণা বলেছেন। আফিং গল্প তারই উদারহণ। সর্বগুণসম্পন্না প্রবাসী বাঙ্গালী মেয়ে সুমিতার বিয়ে হয়েছিল বাংলার সুধীরঞ্জনের সঙ্গে। একজন অভিজাত, ধনবান, রূপবান শিক্ষিত যুবক। সুমিতার মত মধ্যবিত্ত ঘরের মলিনবর্ণ মেয়ে তার চোখে পড়বার কথাই নয়। সুমিতার গুণ দেখেই সে তাকে পছন্দ করেছিল। কিন্তু বিয়েবাড়ির ভিড় কাটতে না কাটতেই সুমিতা বুঝল ভুল হয়ে গেছে। সবখানে বেসুর বাজছে। শ্বশুরবাড়ির মহিলাকুলের অশ্লীল রঙ্গ রসিকতা ও চাপা হাসি, ঠেস দিয়ে কথা ও অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত সে উপেক্ষা করতে পারত, যদি সুধী হত অন্যরকম। কিন্তু দেখা গেল সুধী লোকসমাজে ভদ্র হলেও বাড়িতে এদেরই মত। এসব সে বেশ উপভোগ করে, যোগও দেয়। শুধু তাই নয়, তার এক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি বোন এসে সুমিতাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সুধীর সঙ্গে যে ব্যবহার করতে লাগল তা সহ্য করা কঠিন। মেয়েমহলে কথা চাপা থাকে না। সুমিতা জানল এই মেয়ে বিরজার সঙ্গে সুধীর বরাবরই একটা অশুচি সম্পর্ক ছিল এবং এখনও আছে। আত্মীয়মহল মনে করে পুরুষমানুষ যখন তখন তো এটা এমন কিছু অন্যায় নয়। সুমিতা আরও বুঝল এ বাড়ির আত্মীয়স্বজন তার গুনাবলীর কোনও কদর করে না। বরং তার বই পড়া, ছবি আঁকা, গান করা, বাজনা বাজানোকে তাচ্ছিল্য করে এবং তাকে বলে 'সং' 'পাগল' 'বোকা'। আর সুধী কি মনে করে? না, তার বিদ্যাচর্চায় সুধীর আপত্তি নেই। তবে নববিবাহিত পুরুষ হয়ে রাত্রির সময়টুকু সে তুচ্ছ সাংসারিক কথায় বৃথা ব্যয় করতে চায় না। আর যখন কথা বলে তাতে লাগে প্রভুত্বের সুর — বিরজার সঙ্গে একটাও কথা বললে না কেন? এটুকু ভদ্রতা শেখোনি এতখানি বয়সে'? ইত্যাদি। ক্রমে দূরে সরে যায় স্বামী স্ত্রী। রাত্রির আত্মসমর্পণ ছাড়া সুধীর সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

এই সময় একদিন সুমিতার বাবা এলেন এ বাড়িতে। সুমিতা তাঁর সঙ্গে পিত্রালয়ে চলে গেল চিরকালের মত। সেখানে এসে ফিরে পেল তার পুরনো ঘর, সম্মান ও স্বাধীনতা।

সৃষ্টিসন্ধান

গল্পটি এখানেই শেষ হতে পারত। পৃথিবীর নানা দেশে অল্পবিস্তর এই ধরনের গল্প লেখা হয়েছে। কিন্তু গল্পের লেখিকা এখানে আশাপূর্ণা তাই সুমিতা ইবসেনের নোরা বা রবীন্দ্রনাথের কুমুদিনী হল না। আত্মশক্তিতে নির্ভর করে যে উত্তরণ তা তার জন্য নয়। সে শুধু মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালী মেয়ে। তাই কিছুদিনের মধ্যে সে অশান্ত হয়ে পড়ল। তার কেবলি মনে হয় সুধীর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ আর তার সঙ্গে কটিয়ে আসা অন্ধ উদ্দাম রাত্রিগুলির কথা। তখন সে সুধীর বোধগম্য স্থূল ভাষায় ইনিয়ে বিনিয়ে তাকে চিঠি লেখে। যার মর্মার্থ হচ্ছে, আমার মনকেমন করছে, এসে নিয়ে যাও।

গল্পের 'আফিং' নামকরণ এইভাবেই সার্থক হয়েছে।

আশাপূর্ণার উপন্যাস

ছোটগল্প লিখেই আশাপূর্ণা যখন বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন তখন পাঠক ও সম্পাদক দুই মহল থেকেই তাঁর কাছে উপন্যাস লেখবার তাগিদ আসতে লাগল। অবশেষে ১৯৪৪ সালে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে, কমলা পাবলিশিং এর বিশু মুখোপাধ্যায়ের তাগিদে খুব দ্বিধার সঙ্গে তিনি একটি উপন্যাস লিখলেন। উপন্যাসটির নাম প্রেম ও প্রয়োজন এ লেখার সমাদর আশাপূর্ণার ভয় ভেঙে দিল। এরপর থেকে বারবার তাঁর সাহিত্যরচনা দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে ছোটগল্প এবং উপন্যাস। তুলনামূলক বিচারে যদিও তাঁর ছোটগল্পগুলিই বেশি তীক্ষ্ণ, সূচীমুখ এবং শিল্পসম্মত, তাহলেও তাঁর উপন্যাসগুলি বিস্তৃততর প্রেক্ষাপটে লেখা বলে সেখানে তাঁকে আরও ভালো করে চেনা যায়। ছোট বড় মিলিয়ে তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ২৪২। এর মধ্যে তাঁর ট্রিলজি (প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা) আলাদা উচ্চতা পেয়েছে। এ ছাড়া অন্যগুলির মধ্যে গুনগত উৎকর্ষের খুব বেশি তারতম্য নেই। রচনাভঙ্গীও মোটামুটি একই রকম থেকেছে। অল্পবিস্তর সবগুলির উপজীব্যই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সমাজ, আশাপূর্ণার নিজের সমাজ। আরও দেখা যায়, দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয় নি। সামাজিক সম্পর্কগুলির সম্পর্কে তাঁর যে মোহমুক্ত মনোভাব পূর্বে ছিল পরেও তাই আছে। কেবল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী সমাজের বাইরের চেহারাটা যে পালটে যাচ্ছে এটা তাঁর রচনার কালানুক্রমিক বিন্যাসে স্পষ্ট চোখে পড়ে। ১৯৪৪ এ লেখা উপন্যাসে দেখি সংসারে মেয়েদের কুণ্ঠিত রূপ, প্রণয়ে ভীরুতা, লোকলজ্জার ভয়, একান্নবর্তী পরিবারের মূল্যবোধে আস্থা রেখে পরিজনদের কাছে টানার চেষ্টা, অসহায় বধূর প্রতি শাশুড়ি ননদের অত্যাচার প্রভৃতি। আবার শেষের দিকের উপন্যাসগুলিতে দেখি মেয়েরা অনেক সাহহিনী। তারা আর প্রণয়ে ভীরু নয়। অসহায় ছেলেমানুষ বৌ রূপে তারা শ্বশুরবাড়িতে আসছে না। নিজ নিজ ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে পূর্ণসচেতন হয়ে তারা ঘর করতে আসছে। আসামাত্র পূর্ব পরিকল্পনামত নিজ আধিপত্য বিস্তার করছে। স্বামীর দুর্বল জায়গাগুলি বুঝে নিয়ে দরকারমত তার সদ্ব্যবহার করছে। বড় বড় একান্নবর্তী পরিবার তার ভালো মন্দ নিয়ে এখন বিলুপ্তপ্রায়। উপন্যাসগুলি একসঙ্গে পড়লে আমরা যেন চমকে উঠে অবিষ্কার করি গত পঞ্চাশ বছরে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরসংসারে বাইরের চেহারাটা অনেক বদলেছে বটে, কিন্তু তার স্বভাবের কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয় নি। অত্যাচারী ও অত্যাচারিত হয়ত জায়গা বদলেছে। অত্যাচারিত শাশুড়ির জায়গায় এসেছে অত্যাচারিত বউ। গলা তুলে শাপশাপান্ত গালিগালাজের জায়গায় এসেছে ঠোঁট টেপা বিদ্রুপহাস্য ও দু চারটি মোক্ষম টিপ্পনি। কিন্তু যে স্বভাবের বশে সেকালের অন্তঃপুরিকারা একে অপরকে কষ্ট দিত সে স্বভাবের বদল হয় নি। ঈর্ষা, কানাকানি, ঘোঁট পাকানে, এইসব বিনোদন আজও নারীসমাজে সমান জনপ্রিয়।

আর বাঙ্গালী পুরুষেরা? একশ বছর আগে আমাদের দেশের গড়পড়তা পুরুষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ''আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত। কোনো

সৃষ্টিসন্ধান

বৃহৎ ভাব, বৃহৎ কার্য, বৃহৎ ক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই। অথচ অধীনতার পীড়ন, দাসত্বের হীনতা, দুর্বলতার লাঞ্ছনা তাহাদিগকে নতশিরে সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে পুরুষের কোনো কর্তব্য করিতে হয় নাই, এবং কাপুরুষের সমস্ত অপমান বহিতে হইয়াছে' (পঞ্চভূত)। আজকে বাঙ্গালী পুরুষের অবস্থা হয়ত এতটাই খারাপ নেই। শতাব্দীর মধ্যভাগে যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ ও স্বাধীনতায় বাঙালীর জীবন আমূল বদলে গেছে। আজ আর পুরুষেরা গৃহপালিত নয়, বরং বহির্মুখী। যোগ্যতা থাকলে ভাগ্য সহায় থাকলে জীবনের নব নব ক্ষেত্রে তাদের বিকাশও হয়। কিন্তু ধাক্কা এসেছে অন্য দিক থেকে। পশ্চিমবঙ্গের ওপর অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, তীব্র প্রতিযোগিতা, ভ্রান্ত রাজনীতি ও সমাজের সর্বস্তরে অসাধুতা বাঙালী পুরুষের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিয়েছে। তুলনামূলকভাবে যে পুরুষ জীবিকায় অসফল, আর তাদেরই সংখ্যাধিক্য, চারিদিকে ভোগ্যবস্তুর সমারোহ, পরিবার ও পরিপার্শ্বিক থেকে উঠে আসা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হাজার দাবিদাওয়া, এ সবের মধ্যে পড়ে তারা দিশাহারা। তাদের অনিবার্য হীনমন্যতা ও তাদের জীবনে অন্ধকারের হাতছানি সমসাময়িক পুরুষ লেখকদের রচনায় আমরা পাই। কিন্তু আশাপূর্ণার জগতে তাঁরা আসেন নি। তাঁর উপন্যাসের পুরুষেরা মোটামুটি প্রাক স্বাধীনতা যুগের মানসিকতা সম্পন্ন, রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত পুরুষদের মতই।

তাঁর নারীদের মধ্যে স্পষ্ট দুটি শ্রেনী আছে। একটি শ্রেনী গতানুগতিকতার বাইরে যেতে পারে না। ঈর্ষা, বিদ্বেষ, চক্রান্ত ও স্বার্থসিদ্ধির ছোট ছোট বৃত্তে অবিরাম পাক খেয়ে মরে। এদের মুখের ভাষা, চোখের চাউনি, হাত পা নাড়ার ভঙ্গী সমেত আশাপূর্ণা বন্দী করেছেন এবং চলচ্চিত্রের মত পরিবেশন করেছেন নিজ উপন্যাসে। দ্বিতীয় যে শ্রেণীটি আছে তারা ব্যতিক্রমী মেয়ে। সাহস ও চরিত্রবলের দ্বারা এরা নিজ নিজ অবস্থাকে অতিক্রম করতে চায়। কখনও সফল হয়, কখনও হয় না। তাঁর সত্যবতী (প্রথম প্রতিশ্রুতি) ও সুবর্ণলতা (সুবর্ণলতা) এদের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই শেষোক্ত শ্রেনীর মেয়েরা লেখিকার নিজের খুব প্রিয়। তাঁর আত্মপ্রক্ষেপ ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার। এই দুরকম নারী তাঁর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব উপন্যাসেই আছে। তাঁর যে কোনো একটি উপন্যাস বিশ্লেষন করে ব্যাপারটা দেখা যেতে পারে। আমরা তাঁর প্রেম ও প্রয়োজন উপন্যাসটি বেছে নিলাম। কারণ প্রথম উপন্যাস হলেও, বা সেইজন্যই হয়ত, তাঁর যাবতীয় উপন্যাসের চরিত্রলক্ষণ বীজাকারে এখানে পাওয়া যায়।

তখনো ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। উত্তর কলকাতার এক সরু গলির মধ্যে পাশাপাশি কয়েকটি বাড়ি হল গল্পের ঘটনাস্থল। বাড়িগুলির মধ্যে সবই জরাজীর্ণ, গরিব লোকের বাসস্থল। কেবল একটিই ধনীর অট্টালিকা। ধনী দরিদ্র সব বাড়িতেই যুবক ছেলে আছে, এককালে তারা একসঙ্গে খেলাধুলা করেছে, ও পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বও করেছে। এখন যৌবনের সূচনায় প্রকাশ পাছে তাদের আলাদা আলাদা স্বভাব। শীঘ্রই তারা নানাদিকে চলে যাবে। এই সন্ধিক্ষণ থেকে গল্পের শুরু। ঐ যুবকদের প্রত্যেকের বাড়িতেই ছোট বড় নানা বয়সের স্ত্রী পুরুষ আছে। তাদের বেশিরভাগই পূর্বকথিত গতানুগতিক ধারার, বিশেষত: নারীরা। মাঝে মাঝে গলির মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। তখন ঘটনাস্থলের আশেপাশে বাড়ির ছাদে, বারান্দায়, জানলায়, সুন্দরীদের সকৌতূহল মুখপদ্ম' ফুটে ওঠে। মুখ দেখে বোঝা যায় তারা যারপরনাই পুলকিত। ''এমনি করিয়াই ইহাদের দিন কাটে। আনন্দ নাই, বৈচিত্র্য নাই, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা নাই, দিনের পর দিন একই দিনের পুনরাবৃত্তি।'' এই পরিবেশের মধ্যে দুটি ব্যতিক্রমী মেয়ে ছিল। একজন হল গরিব ঘরের তরুণী বউ আরতি। তার স্বামী ধর্মবাতিকগ্রস্থ উদাসীন ও অমানুষ, শাশুড়ি দজ্জাল, ঘোর দারিদ্যের মধ্যে শিশুসন্তানটিকে নিয়ে সে বাঁচত না যদি না তার দেওর অমরেশ একটু সদয় হত। কিন্তু এই পরিবেশেও তার মুখে হাসি লেগে থাকে। সংসারের অসহনীয় দুঃখকষ্টকে সে পার হতে চায় হেসে তাদের অস্বীকার করে। কারও প্রতি কর্তব্যে কোন ত্রুটি না

সৃষ্টিসন্ধান

করে সে নিজেকে নিজের কাছে উঁচু রাখে। শেষ পর্যন্ত স্বামীর অবহেলায় বিনা চিকিৎসাতে তার শিশু সন্তানটি একদিন মরে গেল। আর সেই ভয়ঙ্কর দুঃখের রাতে তার শূন্য জীবনে এসে উপস্থিত হল একজন পুরুষ। একে সে প্রতিবেশি বলে চিনতো, কিন্তু তার প্রেমিক বলে জানতো না। সে বিবাহিতা, যতই মন্দ হোক তার স্বামী জীবিত তবুও সে এই যুবকের সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং দেশান্তরে গিয়ে বিবাহিত দম্পতির জীবন যাপন করে সুখী হয়েছিল। এই উপকাহিনিতে আমরা আশাপূর্ণার এক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করি। ১৯৪৪ সালে লেখা হয়েছিল এই গল্প। তখনও সমাজ বিবাহিতার দ্বিতীয় প্রেমের ধারণায় ভয় পেতো। শ্রীকান্তের অন্নদাদিদির সতীত্বমহিমায় দেশ ছিল মশগুল। সেই সময়ে আশাপূর্ণা সাহসের সঙ্গে তাঁর এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন যে সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনগুলি আসলে সংস্কার ও অভ্যাসমাত্র, ধর্ম নয়। প্রেম ও প্রয়োজন উপন্যাসে দ্বিতীয় ব্যতিক্রমী নারীটি হল মন্দিরা। সে ছিল ধনীঘরের আদরে পালিত জ্ঞাতিকন্যা, সুন্দরী শিক্ষিতা এবং পাত্রী হিসাবে খুবই লোভনীয়া। সে ভালোবসেছিল প্রতিবেশি এক সহৃদয় যুবককে। উভয়ত এই ভালোবাসা ছিল অনুচ্চারিত। কিন্তু দরিদ্র ছেলেটি মনে মনে ভাবত সে এই ঝকঝকে মেয়ের যোগ্য পাত্র নয়। খানিকটা এই দ্বিধা এবং খানিকটা অন্য পারিবারিক কারণে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে একদিন সে বাড়ি ছেড়ে পালাল। সে চলে যাবার পর মেয়েটি বুঝল তাকে না পেলে জীবন বৃথা। সে অন্য কাউকে বিয়ে করলো না। তার পালক অভিভাবকের মৃত্যুতে তার জীবন ঘোর বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। চারিদিক থেকে চাপ এসেছিল বিয়ের জন্য, তবুও না। শেষ পর্যন্ত সে ছেলেটিকে খুঁজে বার করে। তাকেই বিয়ে করে, সুখে সংসার পাতে। মন্দিরার মত মেয়ে আশাপূর্ণার গল্প উপন্যাসে প্রচুর আছে। তাঁর বকুলকথার ‘শম্পা’ চরিত্রে ও এই মন্দিরাই নবরূপে ফিরে এসেছে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

আশাপূর্ণার শ্রেষ্ঠ রচনা নিঃসন্দেহে ট্রিলজির প্রথম বই প্রথম প্রতিশ্রুতি)১৯৬৪)। লেখিকা নিজেও তাই মনে করতেন। বইয়ের পরিকল্পনা অনেকদিন ধরে তাঁর মনে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছিল। অনেক উপন্যাস লেখবার পর তিনি প্রায়ই ভাবতেন বড় আকারে কোন একটা কাজ করবেন। কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে এসে আজকের মেয়েরা তাদের প্রার্থিত মুক্তির সন্ধান পেল সেই ইতিহাসের প্রথম পর্যায় প্রথম প্রতিশ্রুতি। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে গ্রামের এক বিত্তবান অভিজাত পরিবারের পটভূমিকায় লেখা এই গল্প। অন্তঃপুরের অন্তরালে যে সমাজ ভাঙাগড়ার কাজ চলে সেই নিভৃতলোকের ইতিহাস তিনি এখানে শুনিয়েছেন। ঐ কালপর্বকে বিষয়বস্তু করে বাংলা ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট রচনা আছে। বিমল মিত্রের ‘সাহেব বিবি গোলাম’, বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময় বা ‘প্রথম আলো’ তার উদাহরণ। কিন্তু এই সব বইয়ে আছে ইতিহাসের বিপুল প্রবাহ। প্রাচীন ও আধুনিক দুই শক্তিশালী সভ্যতার সংঘাতে কলকাতা শহর তখন সত্যি সত্যিই কল্লোলিনী তিলেত্তমা। কিন্তু তার ঢেউ পল্লীগ্রামের অন্তঃপুরে পৌঁছত না। সেখানকার ইতিহাসই রয়ে গেছে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ তে।

প্রথম প্রতিশ্রুতিই আশাপূর্ণার সর্বাধিক পরিচিত, আলোচিত ও প্রশংসিত বই। প্রকাশের পরের বছর এ বই রবীন্দ্র পুরস্কার পায়। পাঁচ বছর পর ১৯৬৯ এ পায় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। সুবর্ণলতা (১৯৬৭) ও বকুলকথা (১৯৭৪) এই বইয়েরই সম্প্রসারণ। সুবর্ণলতার যুগ আশাপূর্ণার সমসাময়িক যুগ। তখনকার কালে পুরুষসমাজে আধুনিক যুগের শিক্ষাদীক্ষার হাওয়া লাগলেও নারীসমাজে তার প্রকাশ পরিবারভেদে এক এক রকম ছিল। এ উপন্যাসের পটভূমিকা কলকাতা শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবার; লেখিকার ভাষায় ‘‘যাদের অভিজাত্য নেই অথচ তার অহংকার আছে। সুবর্ণলতা হচ্ছে সেই যুগের যে যুগকে আমরা শৈশবকালে প্রত্যক্ষ দেখেছি। দেখেছি শহর জীবনের চারখানা দেওয়ালের মধ্যে মেয়েদের কী অসহায়তা! কী অবমাননার মধ্যে তাদের সুখের শয়ন পাতা!

‘সুবর্ণলতা’ উপন্যাসটি ট্রাজেডি। মা সত্যবতীর জীবনে যে উত্তরণ ছিল সে সৌভাগ্য কন্যা

সৃষ্টিসন্ধান

সুবর্ণলতার হয় নি। নিজের ন্যায় অন্যায়বোধেয় আগুনে সে নিজেই চিরকাল পুড়ে পুড়ে খাক হয়েছে। শেষ জীবনে, বারান্দায় একফালি বিছানা পেতে সে তার সংসার থেকে পরম উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কেবল একটুকরো আগুন সে সংগোপনে রেখে দিয়ে গিয়েছিল তার কন্যা বকুলের মধ্যে।

আশাপূর্ণা কী পারেননি এবং কেন ?

আজকের দিনে যাঁরা প্রবীণ নাগরিক বকুল তাদেরই সমসাময়িক। এ যুগটা তাদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের অনেকটাই যাপিত জীবনের মধ্যে পড়ে। এটা আমাদের চেনা যুগ। বকুল কিন্তু তার যুগের প্রতিনিধি নয়। এ উপন্যাসের নায়িকাও নয়। তার ভূমিকা দর্শকের। সে শিক্ষিত, স্বনির্ভর এক লেখিকা। অবিবাহিত বলে তার কোনও বন্ধন নেই। ভাইয়েদের সংসারে থাকলেও সেখানে সে লিপ্ত নয়। সে একটু দূর থেকে সব কিছু দেখতে ও বুঝতে চায়। সে ভাবে ''যে সমাজ প্রতিনিয়ত নতুন ঢেউয়ে উত্তাল, মুহূর্তে মূহূর্তে যার রং বদলাচ্ছে, গড়ন পালটাচ্ছে, সে সমাজকে গোটা একটা চেহারায় দেখবো কোথায়বা ধরবো কোনখানে ? আজ যা ভয়ংকর দুঃসাহস বলে গন্য হচ্ছে আগামীকালই তা হয়ে যাচ্ছে জলভাতের মতো আটপৌরে পুরনো। আজকের ফেনিল মূহূর্তগুলোর স্থায়ী কিছু দেবার ক্ষমতা নেই।'' এই উপন্যাসে আধুনিক সমাজের (সত্তর দর্শকের) ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুরকম দুটো কাহিনী আছে। ইতিবাচক কাহিনীতে পাই বকুলের এক দুঃসাহসী ভাইঝিকে, যে সকল লাভালাভের চিন্তা কাটিয়ে এবং সকলের বাধা উপেক্ষা করে নিজের পঙ্গু প্রেমিকাকে নিয়েই ঘর বেঁধেছিল। এই ধরনের মুক্তমনা সাহসিনী নারী আশাপূর্ণার গল্প উপন্যাসে প্রথমাবধি অজস্র আছে। সুতরাং শম্পা বিশেষভাবে একালেরই প্রতীক হয়ে ওঠে নি। আধুনিকতার নেতিবাচক দিকটি দেখানো হয়েছে বকুলের আর এক ভাইঝির মধ্যে যে ফিল্মি দুনিয়ার বাইরের চটকে ভুলেছিল, এবং ভেবেছিল মডেল হয়ে নাম করবে। তার লোভী নির্বোধ মা এ কাজে তাকে প্ররোচনা দিয়েছিল। আজকের প্রশ্রয়শীল সমাজে মেয়েটি দ্রুত অধঃপাতে নেমে যায় এবং পরিশেষে তাকে মরতে হয়। এছাড়া পথভ্রষ্ট আধুনিকতার আর কোনো নিদর্শন কি আশাপূর্ণা খুঁজে পেলেন না। দুই বোনের দু রকম অতিনাটকীয় পরিনাম দিয়ে যুগলক্ষণ নির্দেশ করার দুর্বল কৌশল তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনস্বিনী আশাপূর্ণার পক্ষে কি স্বাভাবিক ? মনে হয় শুধু বকুল নয়, বকুলের স্রষ্টাও আধুনিক যুগে সমাজ নারীর অবস্থান নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। এযুগে সব কিছু অতি দ্রুত পালটাচ্ছে এটাও ঠিক পর্যবেক্ষণ নয়। সময় একটা নিয়তপরিবর্তমান অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। সমসাময়িককালে আমরা তার স্রোতে ভেসে চলি। সে অবস্থায় তার গোটা চেহারা কোনোদিন কেউ পুরোপুরি ধরতে পারে না। যে কালটা অতীত হয়ে গিয়েছে শুধু সেই কালটিরই স্পষ্ট ধারণা আমরা করতে পারি। সত্যবতী সুবর্ণলতার যুগ অতীত হয়ে গিয়েছে বলেই তার স্বরুপলক্ষণগুলি আশাপূর্ণা বিচার করতে পেরেছিলেন। বর্তমানকাল তো এখনও চলছে। তাকে তো অস্থির মনে হবেই।

আরও একটি বিভ্রান্তি আছে বকুলের (তথা আশাপূর্ণার) বিচারে। সেটা তার খুব গভীর ব্যক্তিগত বেদনার জায়গা। সেটা এই - এককালে মেয়েদের সামান্যতম অধিকার পাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। অনেক যুদ্ধের পর আজ মেয়েরা সমাজে ছেলেদের সমানাধিকার পেয়েছে ও মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিতে পারছে। আশাপূর্ণার দুঃখ যে এত কষ্ট করে পাওয়া জিনিসটার সদ্ব্যবহার মেয়েরা করছে না। শিক্ষার সুযোগ পেয়েও তারা মন দিয়ে লেখাপড়া শেখে না। স্বাধীনতা পেয়েও কুকাজে তা নষ্ট করে, উন্নত জীবনের সুযোগ ছিল যার সে তুচ্ছ জিনিসের পেছনে সময় কাটায়। আশাপূর্ণা ভুলে গেছেন যে সেটাই স্বাভাবিক। মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নেবার সময় কেউই সেটাকে দামি জিনিস বলে মনে করে না। হাওয়ার যেখানে অভাব হয় মাত্র সেখানেই মানুষ সচেতন হয়ে বোঝে হাওয়া কত মহামূল্য। আজকের দিনে মেয়েরা

সৃষ্টিসন্ধান

তাদের মুক্ত জীবনকে জন্মলব্ধ অধিকার বলেই জানে তা নিয়ে আলাদা করে সচেতন হবার বা তাকে দুর্লভ সুযোগ মনে করবার কোনো কারণ তাদের নেই। ছেলেরা যেমন যে যার প্রবণতা পরিবেশ অনুযায়ী যুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করে বা করে না মেয়েরাও তাই করছে। মেয়েরা এককালে সামাজিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত ছিল এটা তাদের কাছে ইতিহাসের তথ্য মাত্র; এ জন্য আজ তারা কৃতজ্ঞতার দায়ভার বহন করে চলবে এটা জীবনের সত্য নয়। একালের মেয়েদের কাছে আশাপূর্ণার হয়ত সেরকম একটা প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশা ছিল তাই তাঁর মনে বিষাদের ছায়া পড়ে! মনে হয় সব যেন ঠিক ঠিক চলছে না।

আশাপূর্ণা জানিয়েছেন তিনি সুবর্ণলতার কালের লোক। সেই কালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সমাজ ছিল সম্পূর্ণরূপে পুরুষশাসিত। মেয়েদের নিয়ে এক এক পরিবারে এক এক রকম ব্যবহারবিধি ছিল। ফলে আশাপূর্ণার মত যাঁরা রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা হয়ে জন্মাতেন তাঁদের কপালে জুটত অবরোধবাস। আবার পরিবারবিশেষে মেয়েরা যথেষ্ট স্বাধীনতাও পেতেন। আশাপূর্ণার থেকে প্রতিভা বসু খুব বেশী ছোট নন। তিনি কিন্তু স্কুল কলেজে পড়েছেন। গান শিখেছেন, গান রেকর্ড করেছেন। দিলীপকুমার রায় ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ও তাঁদের স্নেহ লাভ করেছেন। অভিনয় করেছেন, প্রেম করেছেন, এবং প্রেমাস্পদ ব্যক্তিটিকে বিয়ে করে সুখে সংসার করেছেন। সমাজ টুঁ শব্দটি করেনি, কারণ শরৎচন্দ্র বর্ণিত দোর্দণ্ডপ্রতাপ সমাজ তখন কাগুজে বাঘ হয়ে গেছে। প্রতিভা বসু যখন তাঁর নিজের জীবন নিজেই নির্মাণ করছেন তখন কলকাতা মহানগরীর বুকে বসেও আশাপূর্ণা ভয়ে ভয়ে শুধু শিশুসাহিত্যের লেখিকা হয়ে রয়েছেন। পূর্ণ আত্মপ্রকাশের ভরসা পাননি। আর একটু ছোট ছিলেন কবিতা সিংহ। তিনিও উত্তর কলকাতার অভিজাত ঘরের মেয়ে। তাঁর বাল্যকালে কী দেখেছিলেন? ''পাশাপাশি কাকা জ্যেঠা পিসিমাদের বাড়ি। যাকে বলে আত্মীয়ের পাড়া। এখানে দেখেছি বাইরের জীবনযাত্রায় পশ্চিমি কায়দা। ওপর ওপর অ্যালসেসিয়ান, গ্রেট ডেন, ডগশো, ড্রেসিং গাউন, মদ্যপান, ও টমাস মান। ভিতরে ভিতরে ঘোর সংস্কার, সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি। আমার পিসতুতো জাঠতুতো বোনেরা কেউ চোদ্দ বছরের পর কুমারী থাকে নি। ''তাঁর বাল্যবিবাহের পথ আটকে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মা। তাই বোনেদের ভবিতব্য তিনি এড়াতে পেরেছিলেন। তারপর প্রাপ্তবয়স্ক হবার সঙ্গে সঙ্গে করেছিলেন বিদ্রোহ। ইচ্ছামত বিয়ে, দারিদ্র্য, জীবিকার জন্য নানা পেশায় প্রবেশ, শোক, অনেক কিছুই ঘটেছে তাঁর জীবনে, অনেক রকম মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তবে তিনি হতে পেরেছেন কবিতা সিংহ।

আমাদের ভাবতে অবাক লাগে যে আশাপূর্ণার এ সব কোনো অভিজ্ঞতাই হয় নি। অবরুদ্ধ জীবনে শুধুমাত্র স্বশিক্ষিত হয়ে তিনি পরবর্তীকালে যে উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন মহৎ প্রতিভা ব্যতীত তা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই প্রতিভাও খানিকটা ম্লান হয়ে গেল তাঁর অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার জন্য। যে ছোট জগৎটা তাঁর চেনা, সারা জীবন ধরে সেই জগৎটার বাইরে তিনি আর বেরোতে পারলেন না। তাঁর বিষয়ে এলিট সমাজের উদাসীনতার এটাই হয়ত প্রধান কারণ।

আজ তাঁর গল্প উপন্যাসের জগৎ অনেকটাই বদলে গেছে। আরও যাবে। তাঁর চরিত্রাবলীর মধ্যে একমাত্র সত্যবতী ও সুবর্ণলতা ছাড়া আর প্রায় কেউই নেই যে একই সঙ্গে স্বকাল ও চিরকালের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাই ক্রমে ক্রমে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি হয়ে যাবে অচেনা। তখনও আমরা তাঁর বই পড়ব গল্পের অমোঘ আকর্ষণে, আর পড়ব বিগত কালের দুর্লভ তথ্যচিত্র হিসাবে।

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টিসন্ধান

আশাপূণা রচনাবলী

আশাপূর্ণা চাররকম লেখা লিখেছেন - উপন্যাস, ছোটগল্প, শিশুসাহিত্য ও কবিতা। সেগুলির পূর্ণাঙ্গ কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া গেল না। মিত্র ও ঘোষ তাঁর গল্প উপন্যাস যে দশখণ্ড রচনাবলীতে প্রকাশ করেছেন সেইটি, এবং ছোটদের জন্য লেখা প্রধান বইগুলির নাম নীচে দেওয়া হল।

আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলি - মিত্র ও ঘোশ

১ম খণ্ড : বলয়গ্রাস, যোগবিয়োগ, নির্জন পৃথিবী, চারপত্র, প্রথম লগ্ন, সমুদ্র নীল আকাশনীল, উত্তরলিপি, তিনছন্দ, মুখর রাত্রি।

২ম খণ্ড : অগ্নিপরীক্ষা, আলোর স্বাক্ষর, জীবনস্বাদ, আর এক ঝড়, নদী দিকহারা, উত্তরণ, একটি সন্ধ্যা একটি সকাল, জহুরি, মায়াজাল, আত্মপ্রকাশ ছোট গল্প ও রচনা।

৩য় খণ্ড : প্রেম ও প্রয়োজন, নবজন্ম, শশী বাবুর সংসার, উন্মোচন, বহিরঙ্গ, আবহসঙ্গীত, অপ্রকাশিত ছোটগল্প, অপ্রকাশিত কবিতা।

৪র্থ খণ্ড : নেপথ্যনায়িকা, জনম জনম কী সাথী, লঘু ত্রিপদী, দুয়ে মিলে এক (শৃঙ্খলিতা ও সানগ্লাস), শুক্তিসাগর, সুখের চাবি, সুয়োরানির সাধ, সুরভি স্বপ্ন, অপ্রকাশিত ছোট গল্প, অন্যন্য রচনা।

৫ম খণ্ড : মায়াদর্পণ, বৃত্তপথ, মিত্তিরবাড়ি, অতিক্রান্ত, সোনার হরিণ, উড়ো পাখি, যুগলবন্দি।

৬ষ্ঠ খণ্ড : কখনো দিন কখনো রাত, বালুচরি, অনবগুন্ঠিতা, অপ্রকাশিত ছোটগল্প।

৭ম খণ্ড : বিজয়বসন্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়, নীল পর্দা, দূয়ের জানালা, যুগান্তের যবনিকা পারে, দুই মেরু। অপ্রকাশিত ছোট গল্প।

৮ম খণ্ড : প্রথম প্রতিশ্রুতি (প্রথমাংশ)। পলাতক স্বৈনিক, প্রতিয়ার বাগান, ঝিনুকে সেই তারা, অপ্রকাশিত ছোট গল্প।

৯ম খণ্ড : প্রথম প্রতিশ্রুতি (দ্বিতীয়াংশ), সুবর্ণলতা।

১০ম খণ্ড : বকুলকথা, বালির নিচে ঢেউ, অপ্রকাশিত ছোটগল্প।

শিশুসাহিত্য

১। ছোট ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা
২। রঙিন মলাট
৩। গল্পের মত গল্প
৪। হাসির গল্প
৫। কনকদীপ
৬। কুমকুম
৭। মানুষের মতো মানুষ
৮। রাজকুমারের পোষাক
৯। রাজা নই রানী নই
১০। সেই সব গল্প
১১। শোনো শোনো গল্প শোনো
১২। অমরাবতীর অন্তরালে
১৩। ভাগ্যি যুদ্ধ বেধেছিল
১৪। দিব্যসুন্দরের দিব্যজ্ঞান লাভ
১৫। দূরের বাঁশী
১৬। গজা উকিলের হত্যারহস্য
১৭। হাফ হলিডে
১৮। যুগলরত্ন টিকটিকি অফিস
১৯। কপাল খুলে গেলো নাকি
২০। মন থাকলেই মনকেমন
২১। নিজে বুঝে নিও
২২। পাখি থেকে হাতি
২৩। রানী মায়াবতীর অন্তর্ধান রহস্য
২৪। সত্যি আমোদ

—তাঁর বই ও লেখা নানারকম সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে এবং ছোটদের পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

সৃষ্টিসন্ধান